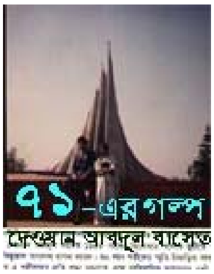

৭১-এর গল্প

দেওয়ান আবদুল বাসেত

কাব্যগ্রন্থ
(নির্বাচিত কবিতার সমাহার)
প্রকাশক ঃ
বৈশাখী
www.marupalash.com
প্রথম প্রকাশঃ
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ / সউদী আরব।
জুলাই ২০০৫ইং

ইন্টারনেট সংস্করণঃ
জুলাই ২০০৫
আষাঢ় ১৪১২বাঙলা
সংশোধিত সংস্করণঃ
ডিসেম্বর ২০০৬ইং
হেমন্ত কাল, ১৪১৩বাঙলা
গ্রন্থ স্বত্ব
লেখক
কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজঃ
লুবনা বাসেত বৃষ্টি / জেকরা বাসেত নদী

সত্য ও সুন্দরের নির্ভীক প্রকাশ

একাত্তরের গল্প

সুপ্রিয় পাঠক বন্ধুগন আপনারা মরুপলাশ ওয়েব ম্যাগাজিনে লক্ষ্য করে থাকবেন আমার এ কাব্যগ্রন্থখানি প্রথমে 'তুমি এলে তাই বৃষ্টি এলো' নামে প্রকাশ করেছিলাম। তার পর পর ভাবলাম নামটি ঠিক যুতসই হয়নি। বিশেষ করে গ্রন্থে এ শিরোনামে কোন কবিতাও নেই। আসলে এ নামটির প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিলো অনেকদিন থেকেই। তাই এমনটি ঘটেছিলো। নাম পরিবর্তনের শেষ মুহূর্তে দেখলাম বেশ ক'বছর পূর্বেই একটি কবিতা লিখেছি আমার দেখা এবং জানাশোনা সেই একাত্তরকে নিয়ে। যদিও তাতে সন্দেহই রয়ে গেছে, আদৌ তা কবিতা হয়েছে কিনা। তবুও বিজয়ের মাস ডিসেম্বর ২০০৬ইং যখন এসে গেলো, তখনই ভাবলাম সেই কবিতাটির শিরোনাম দিয়েই কাব্যগ্রন্থটি নামকরন করা যুক্তিযুক্ত হবে। তাই করলাম।

'একাত্তরের গল্প' গ্রন্থে কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত এবং কবি শামসুর রাহমানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে দু'টি কবিতা রয়েছে। রয়েছে 'দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইমস' এ প্রকাশিত এলিজা গ্রিসউল্ডের লেখা বাংলাদেশ বিষয়ক একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টের প্রতিক্রিয়ায় লিখিত একটি বড় তথ্য সমৃদ্ধ কবিতা। আর যে ক'টা কবিতা রয়েছে ছন্দ ও অছন্দের, তা নিতান্তই একজন লেখকের এলোমেলো ভাবনার প্রকাশ। বিশেষ করে ছন্দে ছন্দে ছড়া লিখতে গিয়ে যখন অছন্দে কিছু ভাবনা এসে যায়, তারই বহিঃপ্রকাশ আমার কবিতাগুলো। আপনাদের বিন্দুমাত্র ভালো লাগলে তা জেনে আমারও ভালো লাগবে। সবাই সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন।

এ গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলো...

একাত্তরের গল্প / বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরহাদ হোসেন / 'নিউইয়র্ক টাইমস'এ ইলিজা গ্রিসউল্ড এর রিপোর্ট পড়ে / মধু কবির জন্মদিনে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি / কবি শামসুর রাহমান এর ৭৬তম জন্মদিনে / শত বসন্ত কেঁদে কেঁদে যায় / চিঠি পেলাম যেদিন / প্রেমের চিঠি লিখতে গিয়ে / বেদনাই চির সই / গেরিলা প্রেমের পদধ্বনি / সকাল-সন্ধ্যা প্রতিদিন / প্রিয়ার মনের ঢেউ / লাগাম বিহীন মন / কবিতার মানসী/ ভালো লাগার গান।

একাত্তরের গল্প

আইয়েরে..... ভাই.... আইয়ে....
একাত্তরের সেই মহান
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন উপরোক্ত
শব্দত্রয় ছিলো তখনকার গ্রামবাংলার
জনগনের জন্যে বিশেষ করে
আমার হোম ডিস্ট্রিক চাঁদপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের
লোকজনের জন্যে এক বিশেষ সতর্ক সংকেত!!

একাত্তরের সেই বিষ-জ্বালাপূর্ণ দিনগুলোতে
ঐ ডাক বা সংকেত যদি কেউ শুনতো
প্রথমেই তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠতো
ফিলে উল্টে যেতো!
পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিম ঝিম করতো!
মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতো।
পেছনে সমস্ত দামী ও প্রিয়বস্তুকে ফেলে
আলাহ্র দেয়া শুধুমাত্র জানটি নিয়ে পালাতো
যে যেদিকে পারে দে-ছুট্!
ঝোপ-জাঙ্গাল, পানিতে,পচা ডোবায়
ধান কিংবা পাট ক্ষেতে আত্মগোপন করতো!
তার কারণ
বর্বর পাকসেনাদের আচরণ এতোই গর্হিত ছিলো যে
ওদের গালি দেবার ভাষাও আমার জানা নেই
ওদের ঘৃণা করতেও আমার ঘৃণা হয়!
আমার দৃষ্টিতে তারা যে পাপিষ্ঠের কাজ করেছে
তাতে ওরা ঘৃণারও উপযুক্ত নয়।

ভরা ভাদর। মানে চারদিকের বিল-ঝিল, নদী-নালা
সর্বত্রই পানি থৈ থৈ করছে
মাঝে মাঝে আপন সন্তানের খোঁজে
দু'একটা ডাহুক-কোড়ার ডাকও ভেসে আসছিলো।

সারা দিনের খরতাপ বিলিয়ে নেতিয়ে পড়েছে
পশ্চিম দিগন্তে ক্লান্ত সূর্য
সময় হবে হয়তো বিকেল পাঁচটা
যেখানে এ গল্পের শুরু
এ গল্পের নায়িকার ললাটে
সিঁদুরের বদলে কলংকের তিলক!?

(২)

একাত্তরের বিধ্বস্ত বাংলার গাঁয়ে-গঞ্জে, শহরে-নগরে
পথে-প্রান্তরে, অলিতে গলিতে
তখন ঘটতো যা নিত্য
আমাদের পেছনের প্রতিবেশী হিন্দু বাড়িতেও
ঘটে গেলো তা অবলীলায়
দিনের প্রদীপ্ত সূর্যের আলোতে।

অনিন্দ সুন্দরী গৃহবধূ দিপালী
সেদিনের সেই সতর্ক সংকেত শোনেও
পাট পচা দুর্গন্ধযুক্ত ডোবায় কিংবা জঙ্গালে
ঝাপিয়ে পড়তে পারেনি।
পারেনি নিরাপদ দূরত্বে পালাতে
যেমন পালিয়েছিলো অন্যরা।
কেননা তার কোলে ছিলো ছ'মাসের বাচ্চা।

তিনজন রাজাকার সহ দু'জন পাক-সেনা
হন্ত দন্ত করে হাতের অস্ত্রটি তাক করে ঢুকে পড়লো
একেবারে বাড়িটির উঠোন পর্যন্ত।

ভাবে-সাবে বোঝা যাচ্ছে যেন মস্তবড়ো শিকারী
তাদের সামনেই যেন একদল চিত্রল হরিণ
কিংবা বাংলার বিচ্ছুর দল মুক্তিসেনা
সামনে তিনজন রাজাকার এবং
পেছনে ধীর পদক্ষেপে মোছে তা দিতে দিতে
এগিয়ে আসছে দু'জন পাক-সেনা।

সবারই লালসা ভেজা চোখ, সন্ধানী দৃষ্টি
এখানে ওখানে খানা-খন্দে...।

এমনি বিপদ সংকুল সময়েও দিপালী তার
পরম আদরের সন্তানকে বাউজের বোতাম খুলে
দুখ দিয়ে শান্ত রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছে
বাড়ির একটি খড়ের মোচার পেছনে
নিজকে কিছুটা আড়াল করে।
দুরু দুরু করছে তার বুক,
কোলের বাচ্চাটির এমনি জড়ো-সড়ো ভাব অসহ্য লাগছিলো
তাই সে বার বারই কেঁদে ওঠার চেষ্টা করলে
দিপালী তার শাড়ির আঁচলে
বাচ্চার মুখ চেপে ধরেছে নিদারুন নিষ্ঠুর ভাবে!

(৩)

না তবুও পেলোনা দিপালী তার শেষ রক্ষা।
আমাদেরই স্বজাতি দু'জন রাজাকার দেখে ফেলে তাকে
হাত ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে আসে তাদের
সেই মহাজনদের কাছে
যারা মহাজন সেজে বসেছিলো
আমাদের এই দেশটির ঘাড়ে বিগত চব্বিশ বছর।

দিপালী কিংকর্তব্যবিমূঢ়! কোন শব্দ নেই তার কণ্ঠে
যেন হঠাৎ আকাশ ভাঙ্গা এক বজ্রপাতে
সে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।
ওরা তার ছ'মাসের কোলের বাচ্চাটিকে ছুড়ে মারলো
সেই খড়ের মোচার উপর।
বাচ্চাটি খড়ের মোচাতে লুটো-পুটি খেয়ে
শেষ রক্ষা পেলো বটে!
কিন্তু সেদিন তার হৃদয় বিদারক কান্নার চিৎকার
শ্রষ্টার সপ্ত আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠছিলো!!

সে দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করে দিপালী

নির্বাক কালী মূর্তি ধারণ করে মূক হয়ে গেলো।
কিংবা বলা যায় যেন মৃত্তিকায় তৈরী
স্বরস্বতি, মাটির পুতুল।
দুর্গা হলে হয়তো একাধিক হাতে
বিভিন্ন হাতিয়ারে আঘাত করতে পারতো
সেই নারি খেকো নেকড়েগুলোকে।
নিতে পারতো চরম প্রতিশোধ।

কিন্তু মানবী সে দিপালী দানবী নয়
তাই সে ছিলো ভীষন দুর্বল-অসহায়, নিরস্ত্র
সে সময়ের অন্য সকল মানুষের মতোই।
ওরা উলাসের সঙ্গোই দিপালীকে একে একে
করে ফেললো নিরাবরণ!
তৃষিত নেকড়ের মতোই ঝাপিয়ে পড়লো
একে একে দু'দুটো আস্ত হিংস্র পাক-হায়েনা
ওরা লুটে-পুটে গেলে পরে
আমাদের স্বজাতি তিনজন রাজাকার
নাকি আলবদর, আল সাম্শ
অজ্ঞান সেই দিপালীকে করলো ভোগ
ওদের চৌদ্দ পুরুষের নাম ডুবায়ে!!

(৪)

হায় ! স্বাধীনতা।
যাঁদের সেই মহান ত্যাগের বিনিময়ে
জন্ম হয়েছে তোমার।
অথচ তুমি কী দিলে সেই বীরাঙ্গনাদের!?
না ওরা পায়নি কিছু!
পায়নি নিদেন পক্ষে একটু সম্মানও!
কেউ বলেনি সেই দিপালীদের কথা
কেউ লেখেনি তাঁদের ত্যাগের কথা
সেই অন্তর্জ্বালাার কথা।
অথচ তোমার বড় বড় বীর গাঁথায়
ভরে আছে যতো অলীক উচ্চারণে,

মিথ্যের ধুলি-বালি আর আবর্জনায়।

(৫)

আমার প্রিয় স্বাধীনতা - হে জননী আমার
চেয়ে দেখো তোমারই বুকে আজ
বহাল-তবিয়তে বড় বড় আসনগুলো দখল করে
সাচি পান খেয়ে এদিক ওদিক পানের পিক ফেলছে
আর পা দু'খানা দোলাচ্ছে সীমাহীন আয়েশে
একাত্তরের সেই পাক-সেনাদের দোসর
এবং চাটুকারগুলো।
যারা সেদিন স্বাধীনতা চায়নি
তারাই আজ এই স্বাধীন দেশটির
পবিত্র জাতীয় পতাকা
নিজেদের গাড়িতে বহন করছে।
হায় এ লজ্জা লুকাবার যে একটুকরো
জায়গাও নেই এই বাংলায়।
হায় স্বাধীনতা!
একটু নজর ঘুরিয়ে দেখো
বুকের ক'খান হাড় নিয়ে
আজও বেঁচে আছে দিপালীরা
দীর্ঘশ্বাসের দেয়ালী জ্বেলে।

(প্রিয় পাঠক কবিতার ভাষা আমার জানা নেই। বাংলা আধুনিক কবিতার ব্যাকরণ এবং এর মাল-মশলা হয়তো এতে কিছুই খুঁজে পাবেন না। কিন্তু ১৪ বছরের একজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধারশাণিত সেই ঈগল চোখে সেদিন যা প্রত্যক্ষ করেছিলাম তারই বস্তু নিষ্ঠ বর্ণনা এতে দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র। -২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৫ রিয়াদ, সউদী আরব)

বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরহাদ হোসেন...
হে ন্যায়ের সৈনিক
তোমার জন্যে আমার একফোঁটা অশ্রু

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে তুমি অস্ত্র জমা দিয়ে
হাতে তুলে নিয়েছিলে শিক্ষার প্রধান অস্ত্র
বই-খাতা-কলম
কেন না তুমি জানতে স্বাধীনতা অর্জন যেমন কঠিন
তারচেয়েও বেশী কঠিন স্বাধীনতা রক্ষা করা।
একটি সুশিক্ষিত জাতি ছাড়া যেমন স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না
তেমনি তাদের দ্বারা দেশের সার্বিক উন্নতিও আশা করা যায় না।

ইংরেজীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে
বেরিয়ে পড়লে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে
ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ
দেশের সীমানার বাহিরে লিবিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ল্যাংগুয়েজ ইনস্টিটিউট
অবশেষে সউদী আরবের রিয়াদে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ।

শিক্ষার আলো বিলিয়ে বিলিয়ে অবশেষে তোমার জীবন প্রদীপ
এভাবে হঠাৎ করেই নিভে যাবে আমরা কেউ ভাবিনি।
মাত্র দু'দিন পুর্বে তুমি প্রয়াত হবার পর
আজ তোমার নামের আগে এবং পরে
আমরা বেমালুম যোগ করে যাচ্ছি বিশেষণের পর বিশেষণ।

অথচ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যখন তুমি স্কুলের চাকরিটি হারিয়ে
মানবেতর জীবন-যাপন করছিলে
তখন তুমি আমাদের কারো বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পাওনি
তোমার স্বভাব চিরউন্নত শির বলেই তোমায়
কেউ পোষা বিড়ালে পরিণত করতে পারেনি।

যার ফলে তুমি মরুভুমির চরম তৃষ্ণা নিয়ে

চিরকালের মতো আমাদের প্রবল ঘৃণা ছুড়ে দিয়ে
নিরবে বিদায় নিলে মহাকালের পথে, মহাজীবনের পথে।
তোমার আদর্শের সহযোদ্ধা হয়েও
আমি কিছুই করতে পারিনি তোমার জন্যে
বন্ধু আমায় ক্ষমা করো... ক্ষমা করো... ক্ষমা করো।

রিয়াদের বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৫সেপ্টেম্বর'০৪ বিকেল ৫ঃ২৬মিঃ রিয়াদের আল ওবায়েদ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন....ইন্নালিলাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন।

রিয়াদ, সউদী আরব।
১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৪ইং

দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইমস্ এ প্রকাশিত বাংলাদেশকে নিয়ে ইলিজা গ্রিসউল্ড এর রিপোর্ট পড়ে

ইলিজা গ্রিসউল্ড
দ্যা নিউ ইয়র্ক টাইমস এ প্রকাশিত বাংলাদেশ কে নিয়ে
তোমার লেখা অনুসন্ধানী রিপোর্টটির
বিপক্ষে আমার বলার কিছু নেই,
তবে স্বপক্ষে বলার অনেক কিছুই আছে-
হ্যাঁ। তোমার সে প্রতিবেদনে উঠে আসা তথ্যগুলো
সত্যের যে অপলাপ নয়,
অন্তত এ কথা বিনা বাক্যে স্বীকার করা যায়।

তোমার অনুসন্ধানী চোখ
ছাড়িয়ে গেছে আমার সকল বিস্ময়কেও!
তোমার দেয়া বিভিন্ন সুত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য
এবং তোমার সরজমিনে ঘুরে ঘুরে উপাত্ত সংগ্রহ করা
এবং তা সবিস্তারে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করা
তোমার প্রতি আমাকে কৃতজ্ঞতায় ভরে দিয়েছে।

একজন বিদেশীনী রিপোর্টারই যেন হঠাৎ করে
খুলে দিলো আমাদের চৌদ্দকোটি জনগণের চোখ,
জাগিয়ে দিলো উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে চলা
আমাদের সরকারকেও।

এমন অনেক তথ্য আমরা প্রতি নিয়তই পাচ্ছি
দেশের পত্র-পত্রিকাগুলোতে তবে-
তাকে পাশ কাটাতে বলি- '*প্রপাগান্ডা অন্‌লি'!*
তখন কিন্তু আমরা জাগিনি, তলিয়ে দেখিনি
বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি কিংবা আরবী ভাইটা কে?
আমাদের ডাল-ভাতের সরকারও
'চোখ বাঁধা ষাঁড়ের মতো'

পড়শীর ফসল নষ্ট করেই চলেছে অহেতুক।

ইলিজা গ্রিসউল্ড

জানো আমাদের আজকাল আর কলমযোদ্ধা,
মেধাধারী লোকের প্রয়োজন নেই একেবারেই (!?)
প্রযুক্তিতেও পিছিয়ে আছি পঞ্চাশ বছর এখনো।
তাতে ভাবনার কিছু নেই!
কেন না আমরা জানি
একটি দেশ, একটি জাতিকে
এমনকি আমাদের এই সাধের গদিটা রক্ষায়
পেশী শক্তিই যথেষ্ট- যা আমাদের আছে!?

তাইতো আমরা এখন মেধা-মননের নামে
জঞ্জালগুলোর প্রস্থান চাই।
আমরা মেধাশূণ্য দেশ চাই, শাসন চাই (!?)

আমার এমনতরো কথাগুলো
তোমাকে করছে অবাক?!
করছে পীড়িত? করছে হতভম্ব !?
তাতো করতেই পারে। কেননা তুমি 'তন্ত্রের লোক।

জানি তুমি বলবে- একটি জাতির জন্যে মেধাই সর্বাগ্রে
মেধাহীন কোন দেশ টিকে থাকতে পারে না।
তাইতো তোমাদের পশ্চিমারা বিভিন্ন প্রলোভনে
প্রতিনিয়ত আমদানী করে চলেছে
পুরো বিশ্ব থেকে বিভিন্ন মেধাধারীদের।
কেন না তোমরাতো আবার 'তন্ত্র -মন্ত্রে বিশ্বাসী।

আমরা কিন্তু খোদার হুকুমে বিশ্বাসী
এখানে যা হয় সবই খোদার হুকুমে হয়।
অবুঝ শিশুকে যখন কোন সন্ত্রাসী মাছের মতো
টুকরো টুকরো করে বস্তা ভরে রাখে
তখন আমরা বলি-'আল্লার মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে' (!?)
রক্ষকের হেফাজতে মা বোন ধর্ষিত হয় খোদার হুকুমে।

জনসভায় গ্রেনেড হামলায় প্রাণহানি খোদার হুকুমে
ক্রস ফায়ারে হত্যা! তাও খোদার হুকুমে
ভাঙ্গা সুটকেস আর ছেঁড়া গেঞ্জি তথ্যধারীরা
হাজার হাজার কোটি টাকায় বিদেশে শিল্প স্থাপন
তাও খোদার হুকুমে।

জিন্দাবাদের দেশটায় দেখো আমাদের কৃতিত্ব
মেধাশূণ্য এবং কলমযোদ্ধা নিপাতে
আমাদের জেহাদী, ক্যাডার ভাইগুলো কতটা তৎপর
কতটা সিরিয়াস! দেখো কী মহান সাহসী !?

দেশ বরেণ্য কবি শামসুর রাহমান জেহাদী ভাইদের কর্তৃক
চাইনীজ কুড়ালের কোপ খেতে গিয়েও
ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন!
আর সেই জানুয়ারী ১৮, ১৯৯৯ সাল হতেই
পুলিশ প্রহরায় দিনযাপন করছেন দেশের প্রধান কবি!
কোন কবি কী এভাবে বাঁচতে চায়?
চেয়েছে কোন দেশে কোনো কালে?

আমরা কলম যোদ্ধা, সৃজনশীল মানুষগুলো এখন
নিদারুণ অন্ধকারাচ্ছন্ন, সাপ-বিচ্ছুতে ভরা
একটি পাগলা গারদে অসহায় বন্দী।

(তবে দু'জন নামকাওয়াস্তে স্বঘোষিত ছন্দের কারিগর ছাড়া
যারা সাহেব-বিবি-গোলামের বাক্সে বসে বসে
প্রভুর ঝুট্-ঝামেলাগুলো সুললিত বিশ্বাসী ভাষায় বয়ান করেন
আর যতগুলো সুবিধা আছে, তা হাতিয়ে নিচ্ছেন!)

আমাদের মুক্ত আলো-হাওয়া অতীব জরুরী।
জরুরী শিশির ভেজা সোনালী রোদ্দুরের সকাল
চাই মুক্ত নীল নীলাকাশ, মুক্ত গানের পাখি
লক্ষ পাখির কূজনে মুখরিত মায়াবী সন্ধ্যা
নিরাপদে পথ চলা আর জোনাকীর

ইলিকঝিলিক স্বাধীন উড়াউড়ি।

চাইলেই কী তা এদেশে পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে?
ব্যর্থতার ফলাফলগুলো তাইতো জলজ্যান্ত
জেহাদী ভাইদের চাপাতির কোপে
ড. হুমায়ুন আজাদ তো বেঁচে গিয়েও মরেছেন
এমন পেছনমুখী বদ্ধ সমাজ থেকে একজন মুক্তচিন্তার মানুষ
মরেইতো বেঁচে গেলেন। আর ছিটিয়ে গেলেন
আমাদের মুখে চরম ঘৃণার থু থু!

৭০হাজার মুক্তিপ্রাপ্ত জেহাদী ভাইদের আবাদে
এখন কয়েকগুণ বেড়েছে তাদের সংখ্যা।
বেড়েছে তাদের কাজের পরিধি, বিচিত্র স্টাইল!
এখন তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডার
নিজেরাই এক একটি মহাগ্রেনেড!

১৫ জানুয়ারী ২০০৪ তাদের সন্ত্রাসী শিকারের তালিকায়
খুলনার মাটি রঞ্জিত হলো সাংবাদিক সত্যভাষী মানিক সাহার রক্তে,
একই বছরের ২৭ জুন রক্ত ঝরে ঝরে নিঃশেষ হলো
সম্পাদক ও সাহসী কলমযোদ্ধা হুমায়ুন কবির বালুর।
২০০২ সালে *দৈনিক পুর্বাচল* এর রিপোর্টার হারুন অর রশীদ
২০০১ সালে *দৈনিক অনির্বান* এর নহর আলী ও শুকুর আলী
২০০০ সালে যশোরের সামছুর রহমান

১৯৯৮ সালে ঝিনাইদহের *বীরদর্পণ* এর ইলিয়াস হোসেন।
ঠিক একই বছরে কালীগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি
রেজাউল করীম অই সকল জেহাদীদের হাতেই
অন্যান্যদের মতো নিজকে বলি দেন।
আরও বলি হলেন ১৯৯৬ সালে
চুয়াডাঙ্গার *দৈনিক দিন বদলের কাগজ* এর বজলুর রহমান
একই বছরে সাতক্ষীরার *পত্রদুত* এর স.ম আলাউদ্দিন।

তালিকা পড়ে পড়ে তুমি বিস্মিত হচ্ছো, বিরক্তি এসে গেছে?
প্লিজ একটু সবর করো আরো আছে

যশোরের *দৈনিক রাণার* এর সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল ভাই
সন্ত্রাসীদের হামলায় প্রাণ হারান।
একই বছরে একই জেলার *'স্ফুলিঙ্গের'* ফারুক হোসেন সাহসী
জেহাদী ভাইদের হাতে অকালে ঝরে গেলেন।

ঝরে গেলো আরো কতগুলো প্রাণ
যশোরের উদীচির সম্মেলনে,
বাংলা নববর্ষে বাংলা একাডেমীর বৈশাখী মেলায়
বোমা বিস্ফোরণে! মুহূর্তে লাশের স্তুপ।
গ্রেনেড হামলায় ২১আগষ্ট ২০০৪ইং জাতির জীবনে কলংকিত দিন
আইভি রহমানের সঙ্গে লাশ হলেন অনেকগুলো নিরীহ প্রাণ।
যার কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া গেলো না আজও !?
তার কারণটা কি এই, যে সর্ষে ভূত তাড়াবে তাতেই ভূত!?

জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা সাংসদ আহসান উল্লাহ মাষ্টার
সভামঞ্চেই যিনি ব্রাস ফারারের শিকার হয়ে
লুটিয়ে পড়েন ঘটনাস্থলেই।
কেন জানি না যার হদিস পাওয়া যায়নি আজও!
অথচ কী আশ্চর্য দেখো, সে মামলার প্রধান আসামী
রক্ষকরাই করেছে ভক্ষন!

ইরানের *সাভাক* স্টাইলে লাইসেন্সধারী *কিলার গ্রুপ*
এখন *ক্রস ফারায়ের* নামে *হিউম্যান রাইট্স* কে
পায়ে পিষে মারছে প্রতিনিয়ত!!
অপঘাতে অপমৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে দেশে।
এ লাশের বহর যে স্বদেশমাতৃকা
বইতে পারছে না আর।

ফরিদপুরের প্রবীর সাহা, ফেনীর টিপু সুলতান
জেহাদী ভাইদের হামলার ফসল,সময়ের দলিল হয়ে
পঙ্গুত্বের অভিশাপ নিয়ে বেঁচে আছে আজও।

তিরিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে
দেখো এলিজা আমরা এখন একেকজন এক একটি বলির পাঠা!

আমাদের এখানে
নেই কোন নিরাপত্তা
নেই কোনো
স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি।
নেই কোনো স্বাধীনতা
মত প্রকাশের বা কথা বলার,
স্বাধীনভাবে কলম চালাবার, জনসভা করার।

না। কোন স্বাধীনতা নেই আমাদের। সেখানে গ্রেনেড ফুটবেই!!
কথায় কথায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি খেতাব মুরতাদ্
যা শরীয়ার বিচারে কতেল বা মৃত্যুদন্ড!!
মুনতাশির মামুন সহ আরো বেশক'জন গুণীজনকে
আমরা মুরতাদ ঘোষণা করে বসে আছি।
ড. কামালের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব
আজ মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়ে বেঁচে আছে।
কিন্তু এ বাঁচা কতদিন বাঁচবে
তার কোন গ্যারান্টি নেই এখানে!

সুপ্রিয় ইলিজা গ্রিসওল্ড

২৩ জানুয়ারী ২০০৫ এ তোমার সেই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি
যখন প্রকাশিত হলো, তখন দেখো
আমরা কী ভীষণভাবে সরব হয়ে উঠলাম
প্রতিবাদের ঝড় তুললাম, নিন্দার যত ভাষা আছে
ব্যবহার করলাম সবই। বাকী নেই কিছুই।
প্রতিবাদ, নিন্দা জানানো আজকাল একটি ফ্যাশন আমাদের।

কিন্তু মাত্র চার দিন পর মানে ২৭ জানুয়ারী ২০০৫ইং এ
যখন হবিগঞ্জের বৈদ্যের বাজারে সকল 'হবি' নষ্ট করে
জনসভায় গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো
প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন, মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব
শাহ্ এ এম এস কিবরিয়া সহ ৫টি মানুষের প্রাণ অকালে ঝরে গেলো।

তখন দেখো আবার আমরা কেমন নীরব হয়ে গেলাম!

উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাতে আমরা বড়ো 'এক্সপার্ট'
সে ভন্ডামিটা এবারও করছি। যার ফসল
প্রকৃত সত্য বরাবরের মতো এবারও
চাপা পড়ে যাবার আশংকা।
কিন্তু এভাবে আর কতদিন বলো কতদিন??

বিশ্বের ১৭৭টি গরীবতম দেশের মধ্যে
আমাদের বাংলাদেশটির স্থান ১৩৮ নম্বরে
'জাষ্ট' কংকালসার সুদান দেশের এক নম্বর আগে।

তাতে কী, আমাদের রয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ট অর্জন
শ্রেষ্ট বাঙালি বঙ্গাবন্ধুর শ্রেষ্ট অবদান
তিরিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত গৌরবময় স্বাধীনতা।
কানাডা ভিত্তিক বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিকদের বিখ্যাত সংগঠন
'মাদার ল্যাগুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' এর প্রচেষ্টায়
আমরা পেয়েছি ***অমর একুশ*** কে, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলাকে
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে।

২০০৬ এর ১৩ অক্টোবর আমরা পেলাম নোবেল শান্তি পুরস্কার।
ড. ইউনূস আমদের বানালেন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত জাতিতে।
আমরা হয়ে গেলাম বিশ্বে শান্তির দুত, শান্তির প্রতীক।
এ আমাদের পরম পাওয়া, পরম অহংকার।

কিন্তু ইলিজা,
আমাদের মধ্যযুগীয় মানসিকতার উত্থানে
আমাদের এসকল অর্জনই আজ ম্লান হতে বসেছে।
সন্ত্রাসে, রাহাজানিতে, ক্ষমতার অপব্যবহারে
বুদ্ধিজীবি ও সংখ্যালঘু নিধনে
পলিটিক্যাল মাডারে, দেশব্যাপী দুর্ণীতির মহামারীতে
আমরা এখন পৃথিবীর প্রথম সারিতেই চলে এসেছি।

০২ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ইং
একযোগে প্রকাশিত অনলাইন পত্রিকা-ভিন্নমত, সদালাপ, মরুপলাশ, খবর
সংশোধিত ও সংযোজিত/ ৩০নবেম্বর ২০০৬ইং

সনেট সম্রাট কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের
১৮১তম জন্মদিনে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি

মধু কবি,
তুমিই দেখেছিলে কপোতাক্ষ নদের বুকে
মা-মাটি ও মানুষের ছবি।
জানি না তোমার মতো অতটুকু দরদ দিয়ে
আর কোন কবি লিখেছে কিনা
কোন নদীকে নিয়ে এমন অনবদ্ধ
চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট।

যদিও তোমায় মোহাচ্ছন্ন করেছিলো ইংরেজী সাহিত্য
'ক্যাপটিভ লেডি' লিখে ইংরেজ কবি হবার 'হবি'।
উচ্চাকাঙ্খার স্বপ্নঘরগুলো যখন
২৬ডিসেম্বর২০০৪এর ***সুনামি***র মতো
মহাধ্বংসযজ্ঞের শিকার হলো!! ঠিক তখনই
ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে
জেগে উঠে একজন প্রবাসী কবির মনে
মা-মাটি-মানুষের ছবি,
কপোতাক্ষ নদের কলোল ধ্বনি।

হে কবি,
কট্টর ধর্মান্ধতা তোমাকে কখনও
দিতে পারেনি পায়ে বেড়ি
তুমি ছিলে না মুসলমান, হিন্দু
বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান
তুমি ছিলে কবি
মানুষের কবি
মাটির কবি
মুক্তচিন্তার কবি
দেশ মাতৃকার কবি।

তোমার সৃষ্টিতে পেয়েছি
প্রকৃতির নির্মল এক নির্ভেজাল ছবি।

যদিও তোমার জন্ম হয়েছিলো সাগারদাঁড়ির বুকে
বহমান ক্ষীণস্রোতা কপোতাক্ষ নদের তীরে
তবুও তোমার মহাপ্রয়ানের পর তোমার সমাধিস্থ হয়েছে
অন্য একটি দেশে। ভিন্ন দিগন্তে, ভিন্ন সংস্কৃতিতে
যেখানে তোমার সমাধি স্থানটি অত্যন্ত অবহেলায়
অনাদরে শ্যাওলারা জড়িয়ে রেখেছে।

হে চির তারুণ্যের কবি
তোমার হাতেই রচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের
'মেঘনাদবধ' প্রথম এবং সার্থক মহাকাব্য
তোমার সে অমর কীর্তিই বানিয়েছে তোমায়
বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' 'একেই কি বলে সভ্যতা'
চরম ব্যাঙ্গা-বিদ্রুপে ভরা তোমার সৃষ্টি
এই পেছনমুখো পঁচনশীল সমাজের জন্যে
প্রহসন এবং এক চরম চপেটাঘাত।

তোমার অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং সনেট আজও অপ্রতিদ্বন্ধী।
আমরা মুখে তোমার সৃষ্টিসম্ভারগুলোর নাম
উচ্চারণ করি গর্ব ভরা কণ্ঠে
ব্যাস এ পর্যন্তই।

যদিও তোমার কবর গায়ে লেখা-
'দাঁড়াও হে পথিক বর'..........
না । সারাটি বছর আমরা কেউ দাঁড়াইনি তোমার স্মরণে
শুধু তোমার জন্ম এবং মৃত্যু দিবসে আমরা কেউ কেউ স্মরণ করি
'জাস্ট ফরম্যালিটি' বজায় রেখেই
আমাদের দায়িত্ব শেষ করি!
যেমন করি আমাদের জাতীয় বিশেষ দিনগুলোতেও।
স্বার্থান্ধ এ পংকিল সময়ের কাছে

আমরা বড়ো বেশী বন্দী!

হায় ! মধু কবি
নিশ্চয়ই তোমার বিদেহী আত্মা আমাদের এই
'বিহেইবিয়র'এর জন্যে সীমাহীন কষ্ট পাচ্ছে।
কষ্ট পাচ্ছে
কষ্ট পাচ্ছে।।

আমিও কষ্ট পাচ্ছি হে কবি
স্বরবৃত্তের ছন্দ নিয়ে উতুপুতু করলেও
কবিতা লিখতে জানি না
তবুও আজ আমার কিছু এলোমেলো শব্দ দিয়ে
তোমাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে পারছি, স্মরণ করতে পারছি
এটুকুই আমার আত্মার সান্ত্বনা।

**কবির জন্ম ঃ ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী।*
মৃত্যুঃ১৮৭৩খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুন।

রচনাকালঃ
রিয়াদ
২৫শে জানুয়ারী ২০০৫ইং

কবি শামসুর রাহমান এর ৭৬তম জন্মদিনে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি

(০৮ কার্তিক ১৪১১বাঙলা * ২৩ অক্টোবর ২০০৪ইং

প্রিয় কবি

যদি তোমার চারপাশ ঘিরে ফুটে থাকতো
শ্বেত-শুভ্র কাশ ফুলের মেলা
কিংবা বকুলেরা ঝরতো ঝুর ঝুর
কার্তিকের নবান্ন এনে দিত
ঘরে ঘরে আনন্দের কোলাহল।

আজকাল নিরাপত্তাহীনতায়
তুমি যেমন ভুগছো তেমনি আমিও
এবং দেশের প্রায় সবাই।
নিরানন্দের এমনি দেশে নবান্ন আর কোলাহল কী
কস্মিন কালেও আশা করা যায়?
যায় না।

তবুও তুমি নিরবধি কলমের তুলিতে
এঁকে যাও হতাশার অন্ধকারে
নিত্য-নতুন ভোরের আলো।
স্বপ্নহীন চোখে দিয়ে যাও স্বপ্ন ।

কিন্তু তোমার মাথা জুড়ে
যে কাশ ফুলের বিস্তার
তা আমাদের বাঙলা সাহিত্যকে দিয়েছে
আরো বিশাল শুভ্রতা-স্বচ্ছতা, স্বকীয়তা।
যার ফসল তোমার কবিতা
হেমন্তের পাকা ধানের সুবাস ছড়ায়
যুগের পর যুগ
ছন্দময়তা এনে দেয় নয়নাদের মনে।

যদি এমন হতো
স্বাধীনতা তুমি........
তোমার সেই অমর সৃষ্টির প্রতিটি পঙক্তি
বাঙলার ঘরে ঘরে সবার মুখে উচ্চারিত হতো
না তা হবার নয়। কেন না বিশুদ্ধ উচ্চারণের বদলে
আজকালতো শেখানো হচ্ছে বিকৃত উচ্চারণ!

কেউ উচ্চারণ করুক বা না করুক
কিন্তু আমার সমগ্র লেখক সত্ত্বা জুড়ে
উচ্চারিত হতে থাকে সকাল-সন্ধ্যা
তোমার সেই অমর সৃষ্টি
স্বাধীনতা তুমি র... প্রতিটি শব্দ।
তাইতো তোমার কাছে ধার করা সুরে
আমিও গাইতে থাকি
ছন্দে ছন্দে....

শত বসন্ত কেঁদে কেঁদে যায়

অনেক কথাই বলতে গিয়ে থেমে যায় কণ্ঠে ভাষা
কথার ছন্দেই খুঁজে পাই শত কুহেলিকাময় আশা।
নিরস মরুতে পায়ে পায়ে হেটে বাড়ালে গোড়ালীর ব্যথা
পেয়েছো কী স্বপ্ন প্রিয়াকে, পেলে তার মনের কথা?

কণ্ঠে তোমার জমাট বেধেঁছে কোটি বেদনার সুর
আরব-অনারব ঘুরে ঘুরে তবু হলো কি বিষাদ দুর?
হবে না বন্ধু, হতে পারে না, এ যে এক কঠিন চাওয়া
আমাদের কি মেনে নিতে পারে এ মরুর লু হাওয়া।

ও বুকে তাই শুন্যতা আর নিঃসঙ্গ হাহাকার
' ভালো আছি খুব' বলে বাহানা কর নিজকে ঠকাবার।
এভাবে নিজকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে ছাই অঙ্গার হলে শেষে
ডুবন্ত সুর্যের লগন এলে কেউ দাঁড়াবে কী পাশে এসে?

না, না, বন্ধু ভুল সব ভুল ভুল সব ধ্যানের মালা
ভেবে যদি থাকো বন্ধু আমায় দাও কিছু তব জ্বালা।
দু'জন দু'জনে মিলে-মিশে ভাগ করে নিই যত ভার-বোঝা
জানি যদিও এসমাজে এটা কঠিন দুর্গম নয়তো সোজা!

যদি আসে আসুক পংকিলতার শত সামাজিক অপবাদ
যদি মেনে নিই দু'জনে তা সেটা হবে মহান অপরাধ!
যদি দু'টি মন মিলে-মিশে হয় নদী থেকে মহাসাগর
সেখান থেকে যদি জাগো তুমি, প্রশান্ত আঁখিদ্বয় ডাগর।

সেটি নয়কি পরম পাওয়া সুখ মাখা ফাল্গুনি গান
তুমি কি চাওনা মেঘে ঢাকা সেই জীবনের অবসান।
তুমি কি চাওনা উদাস বসন্তের হাওয়া ফের জীবনে আসুক?
তুমি কি চাওনা গোলাপের সুবাস ফের কেউ ভালো বাসুক?

তুমি কি চাওনা ডালে ডালে ফের কোকিলের কুহু গান
তুমি কি চাওনা ফুলভরা গাছ, জলভরা নদী, বিহঙ্গের কলতান?
যদি চাও তবে বেরিয়ে আসো শামুকের খোলস থেকে
চেয়ে চেয়ে দেখ শত বসন্ত কেঁদে কেঁদে যায় ডেকে।

১০জানুয়ারী ১৯৯৫ইং
রিয়াদ

চিঠি পেলাম যেদিন

চিঠি পেলাম যেদিন, মন সাগরে জল তরঙ্গ
ওটলো জেগে সেদিন।

ছন্দ হারা নদী, ছন্দ তালে উঠলো জেগে
বইছে নিরবধি।

নিশাচর পাখিরাও, ডানা নেড়ে নেড়ে
আপনার গানে
বুঝায়ে গেল তাও।

অনুরাগে ভিজে চিঠি, পড়ে পড়ে শুধু স্বপ্নে ভাসি
তারা জ্বলে মিটি মিটি।

দুর নীলিমার দেশে, উড়ে এনে দেবো তারার ফুল
তোমার কবরী কেশে।

বাঁধনহারার মতো, তোমার প্রেমকে জয় করতে
উড়বো অবিরত।

শুধু পাশে থেকো প্রিয় সাথী, তোমায় নিয়ে জ্বালাবো আমি
সকল আঁধারে বাতি।

খাসম আল আন
রিয়াদ, সউদী আরব
মার্চ ১৯৯৩ইং

প্রেমের চিঠি লিখতে গিয়ে

প্রিয়া তোমায় লিখবো চিটি মিঠে শব্দ পাইনি খুঁজে,
কাগজ কলম হাতে নিয়ে অনেক সময় যাচ্ছে ঝরে
ধর্মঘটে শব্দেরা সব বিদ্রোহী নাকি বুঝে-সুজে
হয়তো ওদের আসতে দেরী আসবে ওরা অনেক পরে।

কেউ নাকি কাব্যে বন্দী, গল্প কথায় ছলা কলায় পগার পার
কেউ বা আটক নতুন প্রেমে, বাক চাতুরীর নগরীতে
তোমায় চিঠি লিখতে গিয়ে তাইতো লেখা হয়নি আর
ক্ষমা সুন্দর করে দেখো ব্যর্থ আমার কলগীতে।

তুমিতো প্রিয়ে ডুবে আছো আজ অযুত শব্দের গালিচায়
আমার চারিদিকে রয়েছে শুধু ধুলিময় মরু হাহাকার
মায়ের ভাষাও ভুলতে বসেছি হায়!
চিটি লেখা তাই হয়নি আর।

মার্চ ১৯৯৪
রিয়াদ

বেদনাই চির সই

তোমার কণ্ঠে সেই গানটি দারুণ লাগতো
‘না হয় একটু কিছু ওগো তুমি বলো’
আমার হৃদয় নদীতে তখন ঢেউ জাগতো
সেই সুরের মুর্ছনায় চোখ দু’টো হতো ছলো ছলো।

আমি ভাবতাম, এ ঘরে জন্মানো তোমার ঠিক হয়নি
কেন না অমন প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটে এমন ঘরে
তবু স্রষ্টা অনেক কিছুই অপাত্রে দান করে যা রয়নি
তাঁর ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা আমরা বোঝবো কেমন করে?

একদা জোনাকি সন্ধ্যায় ‘কিছু বল..’ মায়াবী সুরের জালে
আমি আটকে গেলাম। সেই যাদুর টানে ছুটি তোমার কাছে
জোনাকির আলোতে ঝিঝিঁরার নূপুরের তালে তালে
আমি তো মানুষ। কিন্তু সে সুর ছিল মোহনীয় রাত্রির কাছে।

তোমার খুব কাছে একটু বাড়ালে হাত বোঝতে পারি
তোমার শরীরের পেলব কোমলতা। অথচ কণ্ঠ রুদ্ধ দুরু দুরু করে বুক
তুমিও ছিলে মৌন মুক। মৌনতা ভেঙ্গে বলি আচ্ছা চলি বাড়ি।
তোমার চোখের তারায় দেখি তখন পেয়ে হারানোর ব্যথা-দুখ।

ফিরে চলি যেই পেছন থেকে সার্ট ধরে টেনে
বললে-এত কাছে পেয়ে কিছু না বলেই চলে যাবে তুমি?
এ বুকের গহীন সাগরে তৃষ্ণার ঢেউ জেগেছে, চলে যাবে তাও জেনে?
বুকে টেনে নাও, প্রেম-প্রীতি দাও দু’কপোলে দাওনা চুমি।

না না তা হয় না প্রিয়ে
ক্ষণিকের উত্তেজনায় চাই না করতে কলংকিত প্রেম
দিচ্ছেনা সায় এই মন-প্রাণ-হিয়ে
তাতে সারাটা জীবন গালি দেবে প্রেম বলে-‘স্যাম স্যাম!!’

বললে- আমার উত্তাল সাগরের তরঙ্গমালায় তরণী বেসামাল
আমার এ তরীর নাবিক যদি হও সেটা হবে পরম সুখ
আমি দেব সাহস সুখ প্রেরণার মন্ত্র, তুমি ধরবে হাল
সুখের ওপারে পৌঁছে যাব করি না ভয় কোন যন্ত্রণা-দুখ।

না, তা আর হলো কই
বেদনাই যেন চির সই
মাঝ সাগরে ডুবে গেল তরী হারালাম তোমায় প্রিয়া
মনোবীণে আজও বিরহের সুর, থেকে থেকে কাঁদে হিয়া।

গেরিলা প্রেমের পদধ্বনি

সেদিন পঞ্চান্ন কিলোমিটার দূর থেকে
টেলিফোনে অনুরোধ করেছিলে
আকুল কণ্ঠে-
লিখতে তোমায় বর্ণিল সব শব্দ দিয়ে
একখানা বর্ণালী প্রেমপত্র কিংবা প্রেমের কবিতা।
যাতে থাকবে
থাকতেই হবে
প্রতিটি শব্দে শব্দে
সীমাহীন আবেগ গলানো ভালোবাসার নির্যাস।

হৃদয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভালোলাগার মমতায়
থাকবে, থাকতেই হবে প্রতিটি পংক্তি
একেবারে জবজবে ভিজে।
আরো বলেছিলে-
চিঠির সূচনায় থাকতেই হবে মিষ্টি মধুর সম্বোধন
যেমন-ওগো মোর মাধবী লতা, রাতের রজনীগন্ধা,
কলমীলতা, ধলেশ্বরী
কিংবা পদ্মা-মেঘনা।

চিঠির বুকে অঙ্গো অঙ্গো জড়িয়ে থাকবে-থাকতেই হবে
অফুরন্ত সোহাগ মাখানো শব্দ আর বাক্যগুলো
যা থেকে চুয়ে চুয়ে পড়বে প্রেমরস
যেমন হেমন্তের প্রভাতে
ঝরে ঝরে পড়ে গোলাপ পাপড়ি হতে শিশির।

ব্যাখ্যা করে বলে দিলে
কবিতাই লিখি আর প্রেমপত্র;
শেষ উপসংহারে যেন থাকে
তোমার অঙ্গা-চাহনীর বন্দনাগীত

যাতে তুমি হবে শিহরিত
পুলকিত, ছন্দিত
ছন্দে ছন্দে যেন নাচে
তোমার বুক ও শরীর।
লেখার অন্তিমে যেন লিখি
ইতি তোমারি আমি।

এর পর পরই রিসিভারে এক প্রবল আকর্ষণীয়
চুম্বনের শব্দে পিলে উল্টে যায়
কাব্যলক্ষ্মীর তৎক্ষণাৎ!
আমার কিছু পংকিল রক্তকণিকার
চরম দাপাদাপি টের পাই।
পাই যেন গেরিলা প্রেমের পদধ্বণি!

স্যরি! টু সে'
প্রিয়দর্শিনী, সুভাষিনী
তোমার জন্যে তাই আর
লেখা হলো না প্রেমপত্র-কবিতা
কেন না আমি নিজেই হয়ে গেছি
বল্গাহারা এক প্রেম দেওয়ানা।

সকাল–সন্ধ্যা প্রতিদিন

বিশুষ্ক হৃদয় মরুতে যে বারিবর্ষণ দিলে
জাগালে যে সমুদ্রে উত্থাল–পাতাল ঢেউ
সে তুমি হে নারী, সুশীতল মন্দাকিনী।
এত দিন তো ভালোই ছিলাম
ছিল না চোখে রঙতুলি, ক্যানভাস
স্বপ্নিল পায়রার ডানা ঝাপটানি, সুরের কাতরতা।
হাসনাহেনার ঝাড়ের পাশ দিয়ে গেলেও
তার মাতাল গন্ধে উতলা হতো না মন
যেমন হয় কিছু শরীসৃপ কীটপতঙ্গ
কিন্তু হঠাৎ এ পরিবর্তন!
তারও সঙ্গত কারণ তুমি।

প্রতিকূল বাতাসের রাজ্যে আমার বসবাস
তাই মন পবনে ওড়ে না আর সোনালী পাল
নিজকে বানিয়ে রেখেছি কাফন জড়ানো এক জীবন্ত লাশে।
আমার মত করেই আমি বেঁচেছিলাম।
বাঁশরির সুরতো ভুলে গেছি কবে জানি না
দোয়েল কোয়েল তো এখন স্বপ্নেও ধরা দেয় না।
অথচ আজকাল ঘুঘু আর চড়ুইপাখির ডাকে
উদাস বাউল হয়ে যাই। আর গাইতে থাকি
আমার দেশের কোন বাউল গায়কের মতো
তারও শেকড়ে একমাত্র তুমি।

তুমিই জাগিয়ে দিলে আমার চেতনার কোষে কোষে
সব ক'টা ঘুমন্ত কীট–পতঙ্গাকে
জাগালে মন ময়ূরীকে,
যখনি পেখম মেলেছে সেই ময়ূরী;
ঠিক তখনি তুমি নেই
কোথাও নেই! হয়তো চলে গেলে

দিগন্ত দৃষ্টির শেষে।

তাই আজ আমি মরি!
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মরি
সকাল সন্ধ্যা মরি!!
দিনের পর দিন মরি।
এ মরা যে অসহ্য যন্ত্রণার মরা!!

প্রিয়ার মনের ঢেউ

পাহাড় বুকে ঝর্ণা দেখে
পাখ্ পাখালি যাচ্ছে ডেকে
ঝর্ণা দেখে মনটা জাগে
চঞ্চলতার অনুরাগে।

উথলে উঠে প্রেমের জোয়ার
পাগলা হাতে প্রিতম ছোঁয়ার।

কিন্তু প্রিয়ার মনটি যেন
সাত সাগরের ঢেউ!
প্রিয়ার মনের ঢেউগুলো কী
গুণতি পারে কেউ?

লাগাম বিহীন মন

লাগাম বিহীন ঘোড়ার মতো
মনটি আমার ছুটতে থাকে,
পাখির মতো উড়ে আবার
আকাশ নীলও লুটতে থাকে!

মুক্ত পাখির মনটি হঠাৎ
কার মনেতে বন্দী হলো?
কার সাথে তার প্রথম দেখা
কার সাথে ফের্ সন্ধি হলো?

কী জানি কোন্ প্রেমের ছোঁয়ায়
আজকে আমি উদাস কবি,
চোখের ঝিলে ভাসতে থাকে
সেই অজানা প্রিয়ার ছবি।

কবিতার মানসী

এক চরম বিরক্তিকর
ক্রিং ক্রিং টেলিফোনের শব্দে
আমার মগ্ন চৈতন্যের দ্বারগুলো খুলে গেল।
একটু অলসভাবেই রিসিভারটি তুলে নিই
হ্যালো বলতেই অপরপ্রান্ত হতে ভেসে এলো
একটি নারী কন্ঠ সঙ্গে মিষ্টি মধুর বাংলা শব্দমালা।
একেবারে দাড়ি কমা ছাড়াই সে অনর্গল বলতে লাগলো..

ঃ কেমন আছো প্রেমিক কবি, আমাকে চিনতে পারছো?
না । চিনতে পারবে না জানি।
কেন না দেখা হয়নি কখনও
কথাও হয়নি
মুখোমুখি হয়ে বসতে পারিনি আজও।
তুমি শুধু দয়া করে বিরক্ত না হয়ে
রিসিভারটি ধরে রাখো আমিই বলছি..
আমি সেই যে তোমার কাব্যলক্ষ্মী
কবিতার মানসী।
-কবিতার মানসী?
ঃ না প্লিজ আজ শুধু আমাকেই বলতে দাও
যাকে না দেখেও কল্পনার রঙতুলি মেখে মেখে
লিখে যাচ্ছো অবিরাম
কত শত গান আর কবিতার মঞ্জুরী।

যাকে তোমার ভাষায় তুমি বলো
ঝুর ঝুর বকুলের গন্ধ
মৌ মৌ সারা দেহমন
যার নির্যাস টেনে টেনে
গড়ে যাও কবিতার দেহ
গানের কলি

যেন আহা মধু অলি
আর গল্পের ভূমি
অথচ সেই তাকে কী একটি বারও
দেখতে চায়নি তোমার মন?

আমি অবাক বিস্ময়ে শোনে যাই তার কথা
বছরের পর বছর যে দেশে কোন নারী মুখ যায়নি দেখা
বলা যায়নি যাদের সঙ্গে কথা
সেই বিরস মরুতে এমন একটি ফোনকল্
নিজভাষা আর মিষ্টি কণ্ঠ
আমার মুগ্ধ শীতলতায় ভরে উঠে মনটি।

এর পর বলি-দেখুন লিখতে গিয়ে কত নামই তো
বর্ণালী হয়ে ফুটে ওঠে কলমের ডগায়
আর সে নামের সঙ্গে যদি আপনার নামটি
ঠিক ঠিক মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়ে থাকে তবে-
সত্যিই তো আপনি আমার কবিতার মানসী
আমার ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন হে মরুর গোধূলী।

সবুজ সত্যি কি জানেন?
আড়ালে আছেন বলেই লেখা যায় আপনাকে নিয়ে
রোমান্টিক সব কবিতা
কলির পর কলি মিলিয়ে হয়ে যায় একটি গান
ছন্দে ছন্দ মিলে যায় অবলীলায়
গড়া যায় স্বপ্নীল বাসর
কাছাকাছি হলে, সামনে এলে
আর যাবে না লেখা কস্মিনকালেও কিছু
তখন হয়ে যাবো আমি অন্য মানুষ।

সেই ভালো আপুনি আমার কবিতার মানসী
প্রিয়তমাসু হয়েই থাকুন,
দুরে বহুদুরে, নীল নীলিমার দেশে
দুর থেকেই দিয়ে যান শুভাশীষ
আর ভালোবাসার পাপড়ি।

হয়তো বা কোন একদিন মুখর বসন্তে
কিংবা কোন রঙঝরা ফাল্গুন গোধুলিতে
মিলিত হবো দু'টি নদী একই মোহনায়
যেমন মিলিত হয়েছে
পদ্মা মেঘনা আর ডাকাতিয়া গভীর আলীঙ্গানে।

সেদিনের প্রত্যাশায় একগোছা রজনীগন্ধা,
তরতাজা বেলী ফুলের মালা হাতে
আমি বসে থাকবো
আপনারই প্রতীক্ষায় গভীর আগ্রহে
যদিও ফিরে যাবে জানি কেঁদে কেঁদে
অনেকগুলো উদাসী ফাগুন
আর ঝরে যাবে গাঁথা মালার ফুলগুলো।

২৪জানুয়ারী ১৯৯৫ইং
রিয়াদ, সউদী

ভালো লাগার গান

আজ ভালো লাগার রাজ্যে আমার বসবাস
আমি মনে করি তুমি আছো আমার দু'চোখের তারায়
তোমার চোখের নীল নদীতে শত স্বপ্নেরা ভেসে বেড়ায়
হাসি খানা যেন লোহিত সাগরের মনিমুক্তা ভরা
দেখে দেখে তাই মুগ্ধ হই প্রাণ হয় আকুল করা।
তোমার বুকের মধ্য থেকে ভেসে আসে শেফালীর নির্যাস
আজ ভালো লাগার রাজ্যে আমার বসবাস।

সেদিন হেসে বলি-প্রিয়ে দেখা ফের কবে-কখন?
জবাব তার-মায়াবী সন্ধ্যায়,
আলো আধারীতে তারারা হাসবে যখন।
দু'জন দু'জনার সাথে সুরভীত সংগীতে
মিলে মিশে হয়ে যাবো একাকার
মধু চন্দ্রিমার খোঁজে দু'জন দু'জনায়
ডুবে যাবো বার বার
এমনি করে বুকেতে আমার করি শত স্বপ্নের চাষ
হাজারো ফুলের সাথে দিবানিশি
আমার এমনি সহবাস তাই
আজ ভালো লাগার রাজ্যে আমার বসবাস।

এমনি মিঠে ভুলের বীজগুলো বার বারই করি চাষ
নিজকে প্রবোধ দেবার এ এক বাহানা, এ এক অভ্যাস
মরুচারিণীকে নিয়ে স্বপ্নেভাসি মরুতেই বসবাস
তাইতো আমার ভালো লাগার রাজ্যে আজ বসবাস।
১৯ জানুয়ারী ১৯৯৫ইং

সমাপ্ত

Email: marupalash@gmail.com